Islami Ain O Bichar
Vol. 18, Issue: 69 & 70
January-March, April-June 2022

মুসলিম উম্মাহর চিন্তানৈতিক মতবিরোধ নিরসনে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর দৃষ্টিভঙ্গি : একটি পর্যালোচনা

Approach of Said Nursi to Resolve Intellectual Disagreements in the Muslim Ummah: A Critical Review

Mohammad Shahidul Islam*

Abstract

Bediuzzaman Said Nursi, the most influential Turkish Muslim theologian, was well versed both in traditional Islamic theology and modern sciences. He played a key role in the Islamic revival in modern secular Turkey through a faith-based movement. He observed closely the ideological differences of the Muslim Ummah and tried his best to resolve them. He called for the establishment of Muslim unity through dialogue, avoidance of hypocrisy and due observance of the methodologies as enunciated in the Qur'an. This article has made recourse to the descriptive and analytical methodology of research. The author demonstrates that Said Nursi, to resolve the differences and divisions of the Muslim ummah, has urged to establish a strong Muslim unity on the basis of full faith in Allah (SWT), tolerance and balanced thoughts. Moreover, he put much emphasis on the presentation of thoughts and arguments with evidence, avoidance of transgression and adoption of moderate approach to accomplish the aforesaid benign project.

Keywords: Differences of Opinion, Resolving Disputes, Said Nursi, Dialogue, Unity.

সারসংক্ষেপ

তুরস্কের মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিক সাঈদ নুরসী ছিলেন ধর্মীয় ও আধুনিক জ্ঞানের আলোয় আলোকিত একজন মানুষ। তিনি বিশ্বাসভিত্তিক আন্দোলনের মাধ্যমে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ তুরস্কে ইসলামী পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। মুসলিম উম্মাহর চিন্তানৈতিক মতবিরোধকে তিনি কাছ থেকে দেখেন এবং তা নিরসনে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কপটতা পরিহার করে সহনশীলতা ও আল-কুরআনের পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান করেন। আলোচ্য প্রবন্ধ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বনে রচিত হয়েছে। এতে দেখানো হয়েছে, সাঈদ নূরসী বর্তমান মুসলিম উম্মাহর মতবিরোধ ও বিভক্তি নিরসনে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস; সহনশীলতা; প্রমাণসহ চিন্তা ও যুক্তি উপস্থাপন; জ্ঞান, ধর্ম ও নৈতিকতার মাঝে সমন্বয় সাধন; সীমালঙ্ঘন পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন এবং বিশুদ্ধ আকিদা (বিশ্বাস)-এর ভিত্তিতে সুদৃঢ় মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন ।

* Dr. Mohammad Shahidul Islam is a Professor, Department of Arabic University of Dhaka, Bangladesh. Email: shahidislam@du.ac.bd

মূলশব্দ : মতপার্থক্য, বিরোধ নিরসন, সাঈদ নূরসি, সংলাপ, ঐক্য।

ভূমিকা

সৃষ্টিবৈচিত্র্যের কারণে চিন্তাচেতনার ভিন্নতা মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বিভিন্ন সভ্যতার অস্তিত্বের মূলে রয়েছে এই চিন্তানৈতিক মতবিরোধ। সভ্যতা ধ্বংসেও রয়েছে এর সীমাহীন প্রভাব। অন্যান্য সমাজের মতই মুসলিম সমাজের প্রায় প্রথম থেকেই চিন্তাভিন্নতার আভাস পাওয়া যায়। ফলশ্রুতিতে কালের বির্বতনে বিভিন্ন 'চিন্তালয়' বা স্কুল অব থট' এর উদ্ভব ঘটে। এসব চিন্তালয়ের মাধ্যমে যেমন ইসলামী আইনের বিকাশ ঘটেছে, মুসলিম সমাজের আইনগত বিশৃঙ্খলা এড়ানো গেছে তেমনিভাবে কখনো কখনো এগুলো বিভেদ আর অনৈক্যের কারণও হয়েছে। আর এসব সমস্যা সমাধানে যুগে যুগে স্থান-কালপাত্র ভেদে ইসলামের ইতিহাসে বেশকিছু একনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটেছে; যারা দিন-রাত কাজ করেছেন, তাঁদের জীবনকে বিলিয়ে দিয়েছেন। এসব ব্যক্তির মধ্যে আধুনিক কালে যেসব মুসলিম ব্যক্তি পশ্চিমা ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদের বিপর্যয় থেকে মুসলিমদের পুনর্জাগরণের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন-তুরস্কের ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (১৮৭৭-১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ)। ইসলামী খেলাফাতের পতনের পর তুরস্ক থেকে যখন ইসলামী মূল্যবোধ ধ্বংস করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হয়, তখন তিনি সমকালীন তুর্কি জনগণের মাঝে ইসলামী সচেতনতা সৃষ্টি, ঈমানের মৌলিক শিক্ষা প্রদান, বিভেদ দূরীকরণ ও মুসলিম একতা-সংহতি বৃদ্ধিতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। এ লক্ষ্যেই তিনি সকলকে মতবিরোধ ও কপটতা পরিহার করে বিভিন্ন মতবাদের লোকদের সাথে সংলাপের মাধ্যমে ঐক্যের আহ্বান করেন। মূলত তিনি সর্বক্ষেত্রে আল-কুরআনকে প্রাধান্য দিতেই পছন্দ করতেন। তাই বক্তৃতা ও লেখনীতে তিনি আল-কুরআনের নির্দেশিত পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এ পদ্ধতি অনুসরণ করেই যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ সফল হয়েছিলেন এবং পরবর্তী জাতির জন্য রেখে গিয়েছেন অনুপম আদর্শ। তাঁর রচিত "রাসাইল আন-নূর" গ্রন্থটি মূলত সংলাপে পরিপূর্ণ একটি গ্রন্থ। এতে ছাত্র-শিক্ষক, মুসলিম-অমুসলিম, মুসলিমদের বিভিন্ন দল এবং বিভিন্ন নবীদের সংলাপ স্থান পেয়েছে। আলোচ্যে প্রবন্ধে ইসলামী সমাজে উদ্ভব হওয়া বিভিন্ন দল-উপদলের বিরোধ নিরসনে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর চিন্তাধারা ও প্রচেষ্টা তুলে ধরার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

মুসলিম সমাজে চিন্তানৈতিক মতবিরোধের উৎস

মানুষ মাত্রই চিন্তা চেতনায়, কাজে-কর্মে একে অন্যের থেকে ভিন্ন।এটাই মানবজাতির স্বভাবজাত প্রকৃতি (Primordial Nature)। আল্লাহর নবীর সময়কাল থেকেই মুসলিম

সমাজে চিন্তার বিরোধ দেখা যায়। তবে সেটার ব্যাপ্তি ছিলো তুলনামূলক অনেক কম। কেননা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতদিন মানুষের মাঝে ছিলেন ততদিন ঐশী প্রত্যাদেশের ধারা ছিলো চলমান। কোনো বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলেই আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি জানিয়ে দেয়া হতো। মুসলিম সমাজে চিন্তানৈতিক মতবিরোধের উৎসের সন্ধান করতে গিয়ে কিছু অনিবার্য কারণ উঠে আসে। যেমন :

(১.) আল্লাহর হুকুম কিংবা রাসূলের নির্দেশ বোঝার ক্ষেত্রে চিন্তার ভিন্নতা। যেমন সহীহ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِيْ بَنِيْ قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمْ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيْقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّيْ حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّيْ لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহযাব যুদ্ধ হতে ফিরার পথে আমাদেরকে বললেন, 'বনূ কুরাইযাহ এলাকায় পৌঁছার পূর্বে কেউ যেন আসর সালাত আদায় না করে'। কিন্তু অনেকের রাস্তাতেই আসরের সময় হয়ে গেল, তখন তাদের কেউ কেউ বললেন, আমরা সেখানে না পৌঁছে সালাত আদায় করব না। আবার কেউ কেউ বললেন, আমরা সালাত আদায় করে নেব, আমাদের নিষেধ করার এ উদ্দেশ্য ছিল না (বরং উদ্দেশ্য ছিল তাড়াতাড়ি যাওয়া)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এ ঘটনা উল্লেখ করা হলে, তিনি তাঁদের কারোর ব্যাপারে কোন বিরূপ মন্তব্য করেননি। (Al-Bukhārī 1987, 4119)

এই হাদীসে দেখা যায়, সাহাবীদের একদল আল্লাহর নবীর হুকুম '*বনূ কুরাইযাহ এলাকায় পৌঁছার পূর্বে কেউ যেন আসর সালাত আদায় না করে*'-এর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেছেন। তাই তাঁরা সময় হয়ে গেলেও নামায পড়েননি। আবার অন্যদল উক্ত নির্দেশের 'উদ্দেশ্যগত' অর্থ গ্রহণ করেছেন। ফলে তারা যথা সময় নামায আদায় করেছেন। এই হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে, আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের কোনো দলকেই তিরস্কার করেননি। এতে বোঝা যায়, চিন্তার ভিন্নতা সবসময় নিন্দনীয় নয়।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ বোঝার ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থ নিতে হবে নাকি উদ্দেশ্যগত অর্থ নিতে হবে–তা নিয়ে পরবর্তীতে মুসলিম সমাজে হিজাজ ও ইরাক কেন্দ্রিক দুটি চিন্তালয়ের বিকাশ ঘটে।

(২.) শরীয়তের বিশেষ কিছু বিধান হয়তো কোনো বিশেষ সাহাবীর কাছে পৌঁছায়নি, যার ফলে তিনি এক রকম মতামত পোষণ করেছেন এবং যার কাছে সেই বিধান সম্পর্কে জ্ঞান ছিল তিনি অন্য রকম চিন্তা করেছেন। ফলে পরবর্তীতে চিন্তার ভিন্নতা প্রকাশ পেয়েছে। অথবা হতে পারে কখনো সাহাবী শরীয়তের বিধানটি ভুলে গিয়েছিলেন। যেহেতু তারা মানুষ ছিলেন সেহেতু তাঁদের থেকে এরকম ভুল হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। যেমন উমার ও আম্মার রা. এর তায়াম্মুম সংক্রান্ত ঘটনায় এর নজীর দেখা যায় ঃ

أَنَّ رَجُلاً، أَتَى عُمَرَ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدْ مَاءً . فَقَالَ لاَ تُصَلِّ . فَقَالَ عَمَّارٌ أَمَا تَذْكُرُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَنَا وَأَنْتَ فِي سَرِيَّةٍ فَأَجْنَبْنَا فَلَمْ نَجِدْ مَاءً فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فِي التُّرَابِ وَصَلَّيْتُ . فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَضْرِبَ بِيَدَيْكَ الأَرْضَ ثُمَّ تَنْفُخَ ثُمَّ تَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَكَ وَكَفَّيْكَ " . فَقَالَ عُمَرُ اتَّقِ اللَّهَ يَا عَمَّارُ . قَالَ إِنْ شِئْتَ لَمْ أُحَدِّثْ بِهِ

এক লোক উমার রা. এর কাছে এসে বলল, আমি অপবিত্র হয়েছি কিন্তু পানি পাইনি (তখন কি করব?)। তিনি বললেন, তুমি সালাত আদায় করো না। তখন আম্মার রা. বললেন, আমীরুল মুমিনীন! আপনার কি স্মরণ নেই যে, আমি ও আপনি কোন এক অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিলাম। অতঃপর আমরা উভয়েই অপবিত্র হয়ে পড়লাম। আর কোথাও পানি পেলাম না তখন আপনি সালাত আদায় করলেন না কিন্তু আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিলাম এবং সালাত আদায় করলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ঘটনা জানালে তিনি বললেন, তোমার জন্যে এটাই যথেষ্ট ছিল যে, তুমি দু'হাত জমিনে মারতে, তারপর ফুঁক দিয়ে আলগা ধুলা ফেলে দিতে তারপর উভয় হাতের কব্জি দ্বারা মাসেহ করতে তোমার দু'হাতে ও চেহারায়। উমার রা.বললেন, "আম্মার! আল্লাহকে ভয় কর"। তিনি ['আম্মার রা.] বললেন, "আপনি চাইলে আমি এটা আর বর্ণনা করব না"।(Al-Nīsābūrī 1991, 368)

(৩.) শরীয়তের বিধান গ্রহণে মানদণ্ডের ভিন্নতা। কখনো এমন দেখা যায়, কোনো আইনজ্ঞ কুরআনে বর্ণিত বিধানের মোকাবেলায় একক ব্যক্তির কোনো বর্ণনা কিংবা মুতাওয়াতির বর্ণনায় পৌছেনি এমন হাদীস ছেড়ে দেন। কেননা হতে পারে, উক্ত ব্যক্তি হাদীসটি ঠিকমত বুঝতে পারেননি কিংবা ভুল শুনেছেন। যেমন উমর রা. তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীর খোরপোষ বিধানের ক্ষেত্রে ফাতেমা বিনতে কায়েস নামক এক মহিলা সাহাবীর বর্ণিত হাদীস গ্রহণ করেননি ।

قالَ عُمَرُ: لا نَتْرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ، لا نَدْرِي لَعَلَّهَا حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ؛ قالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}

উমর রা. বলেছেন, আমরা আল্লাহর কিতাব এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর সুন্নাত এমন একজন মহিলার উক্তির কারণে ছেড়েদিতে পারি না। আমরা জানি না, সে হয়তো স্মরণ রাখতে পেরেছে নাকি ভুলে গেছে! তার জন্য বাসস্থান ও খোরপোষ আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ "তোমরা তাদেরকে তাদের বাসগৃহ থেকে বহিষ্কার করে দিওনা এবং তারাও যেন ঘর থেকে বের না হয়। তবে তারা স্পষ্ট কোন অশ্লীলতায় লিপ্ত হলে ভিন্ন কথা" (Al-Nīsābūrī 1991, 1480)

উপরে উল্লেখিত উদাহরণগুলো থেকে আমরা প্রথম যুগের মুসলিম সমাজে সংঘটিত চিন্তানৈতিক মতপার্থক্যের কিছু কারণ বুঝতে পারলাম। মুসলিম উম্মাহর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজন্মের মধ্যেও চিন্তানৈতিক মতপার্থক্য ঘটেছে। এই চিন্তাবিরোধকে নির্বিচারে

ভালো বা মন্দ বলার সুযোগ নেই। বরং দেখতে হবে, এই মতবিরোকে কেন্দ্র করে কোনো দলাদলি বা আক্রোশ তৈরি হচ্ছে কিনা। যেমন কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই মতবিরোধ মানুষের মাঝে প্রশস্ততা আনে আবার কখনও কখনও এটা বিভেদ-দলাদলি ও হিংসার কারণ হয়। সাঈদ নূরসী তাঁর সংগ্রামমুখর জীবনে এই দলাদলি ও হিংসা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধেই লড়াই করে গেছেন ।

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রাসাইল আন-নূর

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর জীবন একটি ইতিহাস। তাঁর পূর্ণ জীবনটাই ছিল নাটকীয় ঘটনায় পরিপূর্ণ। কেননা তাঁর জীবনকালটি মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, উসমানি খিলাফতের পতন ও ১৯২৩ সালে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের গোড়াপত্তনের গুরুত্বপূর্ণ সময়টিতে অতিক্রম করে। তিনি আল-কুরআনের খিদমতের মাধ্যমে মুসলিম সমাজে সংস্কার, জাগরণ ও ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতা পুনর্বহালে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইসলামী আন্দোলনের অপরাধে তাঁর জীবনের উপর নেমে এসেছিল এক লোমহর্ষক নির্যাতনের স্টীম রোলার। তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বড় অংশটিই শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার, হয়রানি, নির্বাসন ও কারাদণ্ড ভোগের মাধ্যমে অতিবাহিত হয়। তাঁর সম্পর্কে অল্প কথায় বর্ণনা করা অনেক কঠিন। তারপরও এখানে অতিসংক্ষেপে একটি ধারণা প্রদানের চেষ্টা করা হবে।

তিনি ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে পূর্ব তুরস্কের বিতলিস প্রদেশের “নূরস” নামক গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন (Wahidah 2008, 15)। জন্ম থেকেই তিনি ব্যতিক্রম বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর পিতা এমনই একজন ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন যে, তিনি কখনো তাঁর সন্তানদের হালাল ব্যতীত কোন প্রকার খাবার দিতেন না (An-Nursī 2004, 35)। ছোটকাল থেকে তাঁর মাঝে প্রখর মেধা ও ধীশক্তির প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি তাঁর প্রচণ্ড ধীশক্তি বলে মৌলিক বিষয়ে প্রায় ৯০টি গ্রন্থ মুখস্ত করেন। ১০ বছর বয়সে শুরু করে মাত্র ১৪ বছর বয়সে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত করে ধর্মতত্ত্বে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৮৯৭ খিস্টাব্দে তিনি কুর্দি অঞ্চলের “ওয়ান” শহরে গমন করেন এবং গণিত, রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ও ভূগোলশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনি আল-কুরআনের খেদমতের মাধ্যমে মানুষের মাঝে ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত করতে কাজ করে যান। তিনি পাশ্চাত্য ইহুদী ও খৃস্টানদের প্রভাবে মুসলমানদের মাঝে দীর্ঘদিন যাবত বিরাজমান স্থবিরতা থেকে মুসলিম সমাজকে পুনর্জাগরণ; তাঁদের ঈমানের সংরক্ষণ, অজ্ঞতা, স্বেচ্ছাচারিতা এবং অবিশ্বাস থেকে চিন্তার জগতকে পরিশুদ্ধকরণে সংস্কারমূলক কার্যক্রমের আহ্বান করেন। তাঁর সংস্কারমূলক কার্যক্রমের মূলনীতি ছিল ইসলামী ঐকমত্যের লক্ষ্যে বিভিন্ন দল-মত ও ভিন্ন চিন্তার মানুষের সাথে সংলাপের আয়োজন করা। এ সংস্কারমূলক চিন্তাধারাই সমকালীন “দা‘য়ী” (আহ্বানকারী) সমাজের মাঝে তাঁকে বিখ্যাত করে তুলেছিল। এর ফলেই তিনি “বদিউজ্জামান” তথা “যুগের বিস্ময়” /Wonder of the age) নামে খ্যাতি লাভ করেন (Al-Kilanī, Aṣ ṣamdai`Nd. 14)।

তাঁর রচিত “রাসাইল আন-নূর” গ্রন্থটি এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। “রাসাইল আন-নূর” গ্রন্থটি তুর্কি ভাষায় রচিত ১৩০টি রিসালার সমাহার। বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ১৯২৬ থেকে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে তাঁর কারাজীবন ও নির্বাসনের একাকিত্বের দিনগুলোতে ঈমানের মৌলিক বিষয় ও আল-আল-কুরআনের বিস্ময়কর হাকীকতের আলোকে এ মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থটি বর্তমান বিশ্বে তাঁকে অমর করে রেখেছে। এ রিসালাসমূহ ৯ খণ্ডে[১] একত্রিত করা হয়েছে। কেউ কেউ এ গ্রন্থটিকে আল-কুরআনের এক বিশেষ তাফসীর এবং অর্থের দিক থেকে আধুনিক কালের জন্য আল-কুরআনের ‘মুজিযা’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ব্যক্তি জীবনের মৌলিক বিষয় এবং আধুনিক যুগের ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার আলোকে ঈমানের মূল ভিত্তিসমূহের আলোচনা এতে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি ইসলাম থেকে দূরে চলে যাওয়া তুরস্কবাসীকে তাত্ত্বিকভাবে দেখাতে সক্ষম হয়েছেন যে, ইসলাম আধুনিকতাকে নিরুসাহিত করে না; বরং ইসলামই সর্বাধুনিক পথ ও ধর্ম। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতা ও নাস্তিক্যবাদের চরম বিরোধী ছিলেন। এ গ্রন্থে তিনি সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন যে, সুন্দর বিশ্ব বিনির্মাণে ধর্মনিরপেক্ষতা হুমকিস্বরূপ এবং বস্তুবাদ ও নাস্তিকতা বিজ্ঞান, যুক্তি ও সভ্যতার চির শত্রু। গ্রন্থটির গুরুত্ব বর্ণনা করে সাঈদ নূরসী নিজেই বলেন:

> إن الدين هو ضياء القلوب و أما العلوم الحديثة فهي نور العقل، و ها هي تلك الرسائل التي أطلق عليها "رسائل النور"
>
> ধর্ম হচ্ছে অন্তরের আলো, আর আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান হচ্ছে বুদ্ধির আলো। আর ‘রাসাঈল আন-নূর’-তে এ দু’টিই সন্নিবেশিত হয়েছে, (http://ar.wikipedia.org/wiki/بديع_الزمان_سعيد_النورسي)।

তাঁর দৃষ্টিতে মুসলমানদের নেতৃত্ব বা কর্তৃত্বের জন্য সময় ব্যয় না করে, তাদের উচিত আল-কুরআন ও সুন্নাহকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা এবং তার বিধান অনুযায়ী জীবনকে পরিচালনা করা; তবেই তাঁরা দুনিয়া ও আখিরাতে সফলকাম হবে। এ গ্রন্থটি বিশ্বের প্রায় ৫২ টি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

মূলত সাঈদ নূরসীর ২৩ বছর বয়সে যখন ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী উইলিয়াম এওয়ার্থ গ্লাডস্টোন (William Ewart Gladstone, 1809-1898) বিশ্ব শান্তির আলোচনায় মুসলমানদের কটাক্ষ করে বলেন: “As long as there is this book [the Quran], there will be no peace in the world” তখন থেকেই আল-কুরআন ছিল তাঁর মন ও মগজে। তিনি আল-কুরআনের খিদমতে জীবন উৎসর্গ করার শপথ গ্রহণ করেন (An-Nursī 2010, 537)।এরই ধারাবাহিকতায় প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠা সম্বলিত আল

---

১. খন্ডসমূহ হচ্ছে- ১. আল-কালিমাত ২. আল-মাকতুবাত ৩. আল-লাম‘আত ৪. আশ-শা‘য়া‘আত ৫. ইশারাতুল ই‘জাজ ফি মাজানিল ই‘জাজ ৬. আল-মাছনাভী আল-আরাবি আন-নুরী ৭. সাইক্বালুল ইসলামী ৮. সীরাতুন জাতিয়াতুন ও ৯. আল-মালাহিক (আওরহীম, ড. তারিক মুহাম্মদ, ২০১২, ৭-৮)।

কুরআনের ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ “রাসাইল আন-নূর” রচনা করেন যা তাঁকে পুরো বিশ্বে, বিশেষ করে আধুনিক তুর্কী মুসলিমদের মাঝে অমর করে রেখেছে ।

তিনি আল-কুরআনের ধারায় শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে চেয়েছিলেন। মূলত তিনি আধুনিক বিজ্ঞান ও যুক্তিকে ভবিষ্যত জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বিবেচনায় নিয়ে ধর্মীয় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মাঝে সমন্বয়ের অনুসারী ছিলেন। তাই পূর্ব তুরস্কে এমনই একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চিন্তা করেন, যেখানে ধর্মতত্ত্বের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাও থাকবে। পরবর্তীতে তাঁর চিন্তানুযায়ী ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ভ্যান প্রদেশে “মাদরাসাতুয যাহরা” নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ধর্মতত্ত্ব ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষা ধারায় এ প্রতিষ্ঠানটি ঐ অঞ্চলে ইসলাম সম্পর্কে একটি উচ্চতর দর্শনের সূত্রপাত ঘটায়।

তাঁর ‘রাসাইল আন-নূর’ গ্রন্থটির মাধ্যমে তুর্কি যুব সমাজের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে গণজাগরণের সূত্রপাত হয়। তাদের মাঝে একটি স্ট্যাডি সার্কেল গড়ে উঠে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাসা-বাড়িতে এ গ্রন্থটির গভীর পাঠ শুরু হয়। ফলে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি জনপ্রিয়তার এমন এক স্তরে উপনীত হন যে, তুরস্কের ভীতসন্ত্রস্ত স্বৈর-শাসকের রোষানলে পড়েন। অবশেষে দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের পথ অতিক্রম করে এ মহামনীষী ৮৪ বছর বয়সে ১৯৬০ সালের ২৩ মার্চ পরলোকগমন করেন। তাঁকে তুরস্কের “উরফা” শহরে দাফন করা হয়। কিন্তু মৃত্যুর পরও তুরস্কের তৎকালীন সামরিক শাসক তাঁকে কবরে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। তাঁর মৃত্যুর চার মাস পর সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে পরিবর্তন আসলে ১৯৬০ সালের ১২ জুলাই কবর থেকে তাঁর লাশ উঠিয়ে নিয়ে অজানা স্থানে স্থানান্তর করা হয়; যেন তাঁর অনুসারীরা সমাধিকে কেন্দ্র করে একত্রিত হতে না পারে। ফলে তাঁর কবরটি এখনও সাধারণ মানুষের নিকট অজানা রয়েছে (Warghi 2007-2008,81-82)। এর উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবী থেকে, বিশেষত তুরস্ক থেকে সাঈদ নূরসীর আদর্শের মৃত্যু ঘটানো। কিন্তু তাদের সেই ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বরং তিনি তুর্কি সমাজে সফল ইসলামী পুনর্জাগরণে সক্ষম হয়েছিলেন। মূলত তিনিই তুরস্কে বর্তমান ইসলামপন্থীদের জাগরণের ভিত্তি রচনা করেছিলেন। তিনি তাঁর সংস্কারমূলক কার্যক্রম ও “রাসাইল আন-নূর” নামক গ্রন্থের মাধ্যমে বিশ্ববাসী, বিশেষত তুর্কিদের মণিকোঠায় চিরভাস্বর হয়ে আছেন।

সাঈদ নূরসীর দৃষ্টিতে মুসলিম ঐক্যের ধারণা

নূরসীর দৃষ্টিতে মুসলিম ঐক্যের ধারণাটি খুবই আবশ্যকীয় একটি বিষয়। তাঁর নিকট এটি নিরাপদ রুচিবোধের পরিচায়ক; কেননা তা মানবতার মাঝে শত্রুতার পরিবর্তে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধের বীজ বপন করে। তাই এর প্রয়োজনীয়তা সকল যুগেই উপজীব্য। বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী আল-কুরআন ও হাদীসের দিকনির্দেশনার আলোকে এ বিষয়টি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি মুসলমানদের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। কেননা তাঁর দৃষ্টিতে

ইসলামী বিশ্বে স্থবিরতা ও পশ্চাদপদতার মূল কারণই হচ্ছে মুসলমানদের মাঝে মতবিরোধ বা অনৈক্য। তিনি ঐক্যের গুরুত্ব বর্ণনা করে বলেন,

> إن مذهبي هو إبداء الحب للمحبة، و إظهار الخصام للعداء، أي أن أحب شيء إليّ في الدنيا هي المحبة، وأبغض شيء عندي هو الخصام و العداء.
>
> আমার মতাদর্শ হচ্ছে-ভালোবাসার প্রতি অনুরাগ এবং শত্রুতার প্রতি বিরাগ প্রদর্শন। অর্থাৎ আমার নিকট দুনিয়ায় সবচেয়ে প্রিয় বিষয় হচ্ছে (পরস্পরের প্রতি) ভালোবাসা; আর সবচেয়ে অপ্রিয় বিষয় হচ্ছে (পরস্পরের প্রতি) বিরোধ বা শত্রুতা (An-Nursī 2004, 423)।

তিনি আরো লেখেন:

> Practise the brotherhood, love and co-operation insistently enjoined by hundreds of Qur'anic verses and traditions of the Prophet (UWBP)! Establish with all of your powers a union with your fellows andbrothers in religion that is stronger than the union of the worldly! Do not fall into dispute! Do not say to yourself, "Instead of spending my valuable time on such petty matters, let me spend it on more valuable things such as the invocation of God and meditation;". (Nursi 2009, 208)
>
> কুরআন-হাদীসের শতশত আয়াতে যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সহযোগিতা ও ভালোবাসার কথা বলা আছে, সেগুলোর চর্চা করুন। আপনার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজের মুসলিম ভাই-বন্ধুদের সাথে এমন বন্ধন গড়ে তুলুন, যা পৃথিবীর যে কোনো বন্ধনের চাইতেও শক্তিশালী হবে। অন্যের সাথে ঝগড়াঝাটিতে লিপ্ত হবেন না। কখনোই নিজেকে বলবেন না, ‘এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে পড়ে থাকার চাইতে খোদার ধ্যানে মগ্ন হওয়াই তো ভালো’।

তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে-ঐক্যের ধারণাই মুসলমানদের মাঝে মতৈক্যের ক্ষেত্র তৈরি করে। সুতরাং যারা শত্রুতা বা বিরোধকে অবৈধ হিসেবে বিশ্বাস করবে না, তারা যেন ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেই অস্বীকার করলো। তাই যারা ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করেন, কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ বিধানটির বিষয়ে অন্যমনস্ক রয়েছেন; তাদের সম্পর্কে তিনি আশ্চর্যবোধ করেন। তিনি আল-কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, ঐক্যের চিন্তা থেকে অন্যমনস্ক থাকাই মহাবিরোধের শামিল। মুসলমানদের পরস্পরের মাঝে বিরোধ ও শত্রুতাকে তিনি অপরাধ; এমনকি কবীরা গুনাহ হিসেবে বিশ্বাস করেন (An-Nursī 2004, 234)। সুতরাং মুসলিম জাতিকে একমাত্র স্রষ্টার নির্দেশনার আলোকেই এ সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ অনুসন্ধান করতে হবে। মহান আল্লাহ পারস্পরিক বিরোধিতা নিষেধ করে বলেন:

﴿وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ﴾

> আর তোমরা পরস্পর বিরোধে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে (Al-Quran,8 :46)।

আর ঐক্যবিধানের পন্থা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন:

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلإِثْمِ وَٱلْعُدْوَانِ﴾

আর তোমরা সৎকর্ম ও খোদাভীতির ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা কর। পাপ ও সীমালঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সহায়তা করো না (Al-Qurān, 5 : 2)।

সাঈদ নূরসী এ সকল আয়াতের আলোকে ঐক্যের গুরুত্ব খুব গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি মানবতার মাঝে; বিশেষত মুসলমানদের ঐক্যের অগণিত উপাদান খুঁজে পান। কেননা বিরোধপূর্ণ দলসমূহের সকলের স্রষ্টা, রিজিকদাতা, ধর্ম ও নবী একই। এভাবে হাজার হাজার বিষয় পাওয়া যাবে, যা উভয়েরই এক। সুতরাং এ ঐক্যের ভূখণ্ডে হিংসা, কপটতা, বিরোধ ও শত্রুতার অস্তিত্ব খুবই অপমানকর। কেননা তা তার মুসলিম ভাইয়ের সাথে শত্রুতার অবতারণা করে। সুতরাং যাদের অন্তর জীবিত রয়েছে এবং যারা জ্ঞান-বুদ্ধিহীন নয়; তাদের এ বাস্তবতাটি ভালোভাবে উপলব্ধি করার কথা (An-Nursī 2004,341)।

সাঈদ নূরসী এ কঠিন বাস্তবতাটিকে ভালোভাবে উপলব্ধি করেন। কেননা মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও রাসূল ﷺ-এর হাদীসে বিষয়টিকে অত্যধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আল-কুরআনে একতাকে শক্তি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾

আর তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ় হস্তে ধারণ কর; পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমরা আল্লাহর সে নেয়ামতের কথা স্মরণ কর; যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে সম্প্রীতি দান করেছেন। ফলে, তোমরা তাঁর অনুগ্রহে পরস্পর ভ্রাতৃত্বে পরিণত হয়েছ। আর তোমরা এক অগ্নিকুণ্ডের পাড়ে অবস্থান করছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহ তোমাদের জন্য বর্ণনা করেন; যেন তোমরা হেদায়েত প্রাপ্ত হও (Al-Qurān, 3 : 103)।

অনুরূপভাবে বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধের বিষয়ে কঠোর সতর্ক করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

(আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং তাদের নিকট স্পষ্ট বর্ণনা (নিদর্শন) আসার পরও বিরোধিতা করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি (Al-Qurān, 3 :105)।

অপর এক স্থানে এসেছে:

﴿إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ﴾

নিশ্চয়ই যারা স্বীয় ধর্ম খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে; তাদের সাথে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের বিষয়টি আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। অতঃপর তিনি তাদের বর্ণনা করবেন, তারা যা কিছু করছে (Al-Qurān, 6 : 159)।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঐক্যের গুরুত্ব ও বিরোধের প্রতি হুঁশিয়ারি করে ঘোষণা দেন:

عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنَ الاثْنَيْنِ أَبْعَدُ وَمَنْ أَرَادَ بُحْبُحَةَ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِالْجَمَاعَةِ.

(তোমাদের উচিত জামাত বা একতাবদ্ধ থাকা। সুতরাং তোমরা বিচ্ছিন্নতা থেকে বিরত থাক; কেননা একজনের (বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি) সাথে শয়তান থাকে। সে দুইজন (একাধিক ব্যক্তির দল) থেকে দূরে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি জান্নাতের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য প্রত্যাশা করে সে যেন জামাতবদ্ধ থাকে (Ash shaibānī ND, 42)।

সুতরাং আল-কুরআনের এ সকল আয়াত ও রাসূল ﷺ-এর হাদীসের প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকলে, তাঁদের পক্ষে বিভিন্ন দল-উপদল ও মাযহাবে বিভক্ত হয়ে বিরোধে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু মুসলমানগণ যখন আল-কুরআন ও হাদীসের এ শিক্ষা থেকে দূরে রয়েছে; তখনই তাঁরা বিভিন্ন দল-উপদল, শাখা-প্রশাখা ও জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ফলে তাঁদের শক্তি খর্ব হয়ে পড়েছে; তাঁদের সুখ-শান্তি বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে এবং তাঁদের উপর অন্যরা কর্তৃত্ব করতে শুরু করেছে।

সাঈদ নূরসী আল-কুরআন ও হাদীসের এ শিক্ষাটি প্রচণ্ডভাবে উপলব্ধি করেন। তাই তিনি বিশ্বাস করেন, শরী'আতের দৃষ্টিতে মুসলমানদের মাঝে জিহাদ (যুদ্ধ)-এর সুযোগ নেই। সুতরাং জিহাদ হবে অমুসলিমদের সাথে। তবে মুসলমানদের মাঝে হবে দাও'আত, জ্ঞান ও উপদেশের যুদ্ধ (Al Lama`t 1993)। তাই তিনি **১৯১১** সালে সিরিয়ার উমাইয়্যা মসজিদে প্রদত্ত বক্তৃতাতে ইসলামী বিশ্বের এ সমস্যাটিকে মুসলিম জাতির রোগ হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর দৃষ্টিতে এ সমস্যার পশ্চাতে ৬ (ছয়) টি বিষয় কাজ করে। তা হচ্ছে (An-Nursī 2004,491-492)।

১. হতাশাপূর্ণ জীবন;
২. সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে সততার বিলুপ্তি;
৩. শত্রুতা বা বিরোধ প্রিয়তা;
৪. মুমিনদের পরস্পরের মাঝে বন্ধন বিষয়ে অজ্ঞতা;
৫. বিভিন্ন প্রকার সংক্রমণকারী আত্মিক রোগের প্রবাহ ও
৬. ইচ্ছা শক্তিকে আত্মকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ করা তথা ব্যক্তিস্বার্থকে অন্য সবকিছুর উপর প্রাধান্য দেয়া।

এ সবক'টিই অন্তরের মাঝে অহংকার, আমিত্ব (আনানিয়্যাহ), হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার জন্ম দেয় এবং একতাকে বিনষ্ট করে। তিনি সমসাময়িক সমাজ ব্যবস্থা

থেকে উপলব্ধি করেন যে, ইউরোপীয়রা বস্তুজগতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি লাভ করেছে; অন্যদিকে উপরোক্ত ব্যাধিসমূহ মুসলমানদেরকে জাগতিক উন্নতি ও অগ্রগতির দিক থেকে জাহেলী যুগের অচলাবস্থায় আবদ্ধ রেখেছে। তিনি এ বক্তৃতাতে এ সমস্যা থেকে মুক্তির পন্থা হিসেবে আশা, সততা, ভালোবাসা, পারস্পরিক বন্ধন ও পরামর্শকে উপায় হিসেবে চিহ্নিত করেন।

সাঈদ নূরসীর সংস্কার দর্শন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর শুরুতে পৃথিবীর ইতিহাসে যে সকল সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকদের আগমন ঘটেছে তাঁদের মধ্যে সাঈদ নূরসী অন্যতম। তিনি তুরস্কে উসমানি খিলাফতের পতন ও সেকুলার তুর্কি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার পর এমনই এক পরিস্থিতিতে জীবন কাটিয়েছিলেন, যখন তথায় ইসলাম ও মুসলমানদের উপর দিয়ে এক গাঢ় কালো মেঘ অতিক্রম করছিল। সে সময়ে তুরস্কে এক ধরনের অজ্ঞতা, দারিদ্র, অবিশ্বাস ও সীমালঙ্ঘনের পরিবেশ বিরাজ করছিল। মুসলমানদের সামগ্রিক কার্যক্রমের উপর বড় ধরনের বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়েছিল। অনেক মসজিদে সালাত আদায়ের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল।'আয়া সুফিয়া'র ন্যায় মুসলিম বিজয় ও ঐতিহ্যের ধারক মসজিদটিকে যাদুঘরে রূপান্তরিত করা হয়। এমনকি আরবি ভাষায় আযানকেও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। সে সময়ে আল-কুরআন আরবির পরিবর্তে ল্যাটিন বর্ণে লিখার ব্যবস্থা করা হয় এবং সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ইসলামী শিক্ষা বন্ধ করে দেয়া হয়। তাওহীদ, একত্ববাদ ও রিসালাতের বিরুদ্ধে নাস্তিকতাবাদকে ব্যাপকভাবে উস্কে দেয়া হয়। তুরস্কের এ যুগসন্ধিক্ষণে সাঈদ নূরসী ইসলামী আদর্শ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য সংরক্ষণে অকুতোভয় সৈনিকের ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমাজে প্রচলিত এ সকল সমস্যা নিয়েই উদগ্রীব ছিলেন। মুসলিম জাতির জাগরণ ও ইসলামী শরী'আর প্রাণ সঞ্চালন তাঁকে সর্বক্ষণ তাড়িত করছিল। তিনি সমাজের সকল সমস্যা সমাধানের পথ অনুসন্ধানে নিজেকে উৎসর্গ করেন। এ জন্য জীবনের অধিকাংশ সময় কারাগার অথবা নির্বাসনের নির্যাতনে কাটাতে হয়েছে। তারপরও মুসলিম সমাজের এ দূরবস্থা লাঘবের ব্রত থেকে তাঁকে এক বিন্দুও পিছপা হতে দেখা যায়নি। এ দীর্ঘ সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে বিবাহ করা থেকে নিজেকে নিবৃত রাখেন (Aḍ-ḍaghamīn 2008, 11)। তিনি জীবনের সবকিছু থেকে ঈমান ও ঈমানী ঝাণ্ডা বহন করাকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন:

> إنّي أقول لكم دون خوف أو خشية: إنّه لو كان لي ألف نفس لم ترددت في التضحية بها في سبيل إيماني و في سبيل آخرتي، و اعلموا أنتم ما بدا لكم! و سيكون آخر كلامي: حسبنا الله و نعم الوكيل.
>
> আমি ভয় ও সংকোচহীনভাবে বলছি: আমার হাজারটি জীবন থাকলেও তার সবকটিকে ঈমান ও পরকালীন পথে ব্যয় করতে দ্বিধা করতাম না। তোমারও জানা দরকার, কী করা উচিৎ। আর আমার শেষ কথা হচ্ছে: আল্লাহ আমার জন্য যথেষ্ঠ এবং তিনি আমার উত্তম অভিভাবক (An Nursī 1993,426)।

তিনি সমাজের সমস্যাকে ব্যাধি হিসেবে চিহ্নিত করে তার সুচিকিৎসা তথা সংস্কারের পথ অনুসন্ধানে উদ্বিগ্ন ছিলেন। এ ক্ষেত্রে তিনি আল-কুরআনের পন্থা অবলম্বন করে কৌশলের আশ্রয় ও সুন্দর উপদেশের নীতি গ্রহণ করেন। কেননা আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে এরশাদ করেন:

> ﴿أَدْعُ إِلى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الَحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ﴾
>
> আপনি কৌশলে এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আপনার পালনকর্তার প্রতি আহ্বান করেন এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন (Al- Qurān, 16 :125)।

তাঁর দর্শন ছিল সরকারের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হয়ে, মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিশুদ্ধি করা। সামাজিক সংস্কারে তাঁর 'রাসাইল আন-নূর' গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ গ্রন্থের আলোকে তাঁর সংস্কার কার্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে:

১. ধীরতার নীতি অবলম্বন;
২. মধ্যম পন্থা অবলম্বন, পক্ষপাতিত্ব না করা;
৩. আত্মিক (রোগের) পরিশুদ্ধির উপর নির্ভর করা;
৪. আঞ্চলিকতাকে পরিহার করে ইসলামী বিশ্বের ঐক্যের প্রতি গুরুত্বারোপ;
৫. রাষ্ট্রের সংস্কার বিধানে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা এবং ব্যক্তি কল্যাণের উপর সামষ্টিক কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়া; ও
৬. জীবনের সকল দিকের প্রতিই গুরুত্বারোপ (Ṭanṭāwi ND, 139-148)।

তাঁর সংস্কার নীতির আরো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে:

১. ব্যক্তির আকিদা (বিশ্বাস) বিশুদ্ধকরণ;
২. ব্যক্তির আচরণ সংশোধন করা;
৩. মুমিনদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ককে সুদৃঢ় করা;
৪. সততা ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন;
৫. নিজ থেকে সংস্কারের সূচনা;
৬. আত্মার বাহ্যিকতা থেকে অভ্যন্তরীণ সংস্কারে গুরুত্ব প্রদান;
৭. একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্যই বন্ধুত্ব স্থাপন;
৮. ইসলামী সমাজকে সুদৃঢ়করণ;
৯. ইসলামের বিজয়ে আত্মিক ও বস্তুগত জিহাদ করা;
১০. ভবিষ্যতের প্রতি গুরুত্বারোপ;ও
১১. মহাবিশ্ব সম্পর্কে সচেতনতা।

ইসলামী সমাজে বিরোধের কারণ ও সমাধানের পন্থা

ইসলামের শিক্ষা হচ্ছে মুসলিমগণ পরস্পর ভাই-ভাই;একে অপরের পরিপূরক। তাই মুসলমানগণ পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতার মাধ্যমে সুদৃঢ় সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে;

এটাই হচ্ছে ইসলামের মৌলিক বিধান। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে, বিশ্বের অন্যান্য সমাজের ন্যায় ইসলামী সমাজ তথা মুসলিম সমাজেও অনৈক্য তথা বিরোধের অস্তিত্ব দেখা যায়। সাঈদ নূরসী ইসলামী সমাজ তথা মুসলিম বিশ্বে ঐক্য বিনষ্ট ও বিরোধের কিছু কারণ চিহ্নিত করেছেন। তা হচ্ছে:

১. ইসলামের মৌলিক বিষয়সমূহ অনুধাবনে অজ্ঞতা; কেননা মুসলিম জীবনে এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং যার মাঝে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান পরিপূর্ণ থাকবে, তার নিকট বিভিন্ন উপদলের মতানৈক্যটি গৌণ অনুভূত হবে। আর যার মাঝে এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানের অভাব থাকবে, তার নিকট মতানৈক্যটি মূখ্য অনুভূত হবে। ফলে ঐক্যের বন্ধনে ফাটল প্রকট আকার ধারণ করবে। সাঈদ নূরসী এ বিষয়টি গভীরভাব উপলব্ধি করেন। তাই এ ধরনের বিরোধ, শত্রুতা ও বিবাধের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। আর এ থেকে মুসলিম সমাজকে নিবৃত রাখতে "জামি'আতুয যাহরা" প্রতিষ্ঠা করেন; যেখানে ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি পার্থিব জ্ঞানও শিক্ষা দেয়া হয়। এতে করে আধুনিক বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি ধর্মীয় জ্ঞানের ফলে মুসলিম সমাজ সংশয় ও নাস্তিকতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে। অনুরূপভাবে ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি বিজ্ঞান চর্চার ফলে তাঁরা সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামি থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে (Ṭanṭāwi ND, 25-27 ,52)।
২. বিশ্বাসগত আত্মিক শিক্ষার প্রতি প্রতিশ্রুতির অভাব;
৩. গর্ব ও অহংকারে সীমালঙ্ঘন;
৪. ক্ষমতা অনুধাবনে সীমালঙ্ঘন;
৫. কাজের মূল্যায়ন না করা;
৬. শৃঙ্খলা বিধানের অভাব ও কাজে অদক্ষতা; ও
৭. অসহিষ্ণুতা ও আধিপত্যের প্রাধান্য।

এ সবকটিই অন্তরের মাঝে অহংকার, আমিত্ব (আনানিয়্যাহ), হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতার জন্ম দেয় এবং একতাকে বিনষ্ট করে। সাঈদ নূরসী মুসলিম সমাজের এ সকল সমস্যা নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন। তাঁর সংস্কারমূলক কার্যক্রমের অন্যতম ভিত্তি ছিল, মুসলিম সমাজে বিরাজমান সমস্যা বিলুপ্ত করে তাদের পরস্পরের মাঝে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। তিনি সর্বদাই অনৈক্যের বিরোধী ছিলেন। তিনি সমাজের এ সমস্যা সমাধান ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় নিম্নোক্ত বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করেন:

১. আল-কুরআনের শিক্ষা ধারণ করা; কেননা আল-কুরআন মানুষকে ঐক্যের দিকে আহ্বান করে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এইটাই মূল ভিত্তি।
২. ইখলাস তথা নিষ্ঠা; কেননা ইখলাস ব্যতীত মানুষ কখনো লোভ-লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ ও গর্ব-অহংকার থেকে মুক্ত থাকতে পারে না। সুতরাং এটা ব্যতীত সামাজিক সমৃদ্ধি কল্পনা করা সুদূর পরাহত।

৩. ভ্রাতৃত্ববোধ; কেননা প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববোধ ব্যতীত সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। সাঈদ নূরসী সামাজিক এ বাস্তবতাটি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তাই তিনি তাঁর অনুসারীদেরকে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আর এ বিষয়টির গুরুত্বের জন্যই তিনি তাঁর রাসাইলে 'ভ্রাতৃত্বে বিলীন' (الفناء في الإخوان) নামে একটি অধ্যায় নির্ণয় করেছেন।
৪. ব্যক্তি স্বার্থের উপর সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া; কেননা সমাজে ঐক্যের বিষয়টি কল্পনাও করা যায় না, যদি সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়া না হয়। সাঈদ নূরসী বিষয়টি উপলব্ধি করে তিনি তাঁর রাসাইলের মাধ্যমে এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।
৫. 'আমিত্ব'কে (আনানিয়্যাহ) পরিহার করা; কেননা আল-কুরআনের শিক্ষাই মুসলিম সমাজের মূল ভিত্তি। অপর দিকে ব্যক্তিস্বার্থের উপর সামষ্টিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে না পারলে এবং পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ না থাকলে কখনো সামাজিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। সাঈদ নূরসী এ বাস্তবতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁর অনুসারীদের (যাদের 'তালাবাতু নূর' বা 'নূরজু' তথা নূর জামাত বলা হয়) মাঝে এর বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায়। তাঁদের অন্যতম দর্শন হচ্ছে "আল-ফানাউ ফিল উখওয়াহ" (ভ্রাতৃত্বে বিলীন হওয়া)। তিনি আমিত্বকে পরিহার করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর দর্শন বর্ণনা করে বলেন

أن مسلكي حق و هو أفضل و أجمل" من دون أن يتدخل في أمر مسالك الآخرين، و لكن لا يجوز له أن يقول: "الحق هو مسلكي فحسب" أو أن الحسن و الجمال في مسلكي وحده" الذي يقضي على بطلان المسالك الأخرى و فسادها.

"আমার অনুসৃত পথ হচ্ছে হক (সঠিক), শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর, অন্যদের অনুসৃত পথগুলো সম্পর্কে কোন সমালোচনা থাকবে না। কিন্তু এ কথা বলা উচিত হবে না যে, "আমার পথই একমাত্র সঠিক পথ অথবা ভাল ও সুন্দর একমাত্র আমার পথেই" যা অন্যদের অনুসৃত পথগুলোকে বাতিল ও মন্দ বলে সাব্যস্ত করে (An-Nursī 2004, 228)।

তিনি আমিত্ব, প্রতারণা ও আত্মপ্রশংসার প্রতি ভালোবাসাকে ঈমানের পরিপন্থি হিসেবে চিহ্নিত করেন। সুতরাং তাঁর দৃষ্টিতে ঈমান এবং আত্ম-অহংকার ও প্রতারণা একসাথে মিলিত হতে পারে না। তাই তিনি বর্তমান যুগের মুসলমানদের মাঝে ঈমানকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যে এসব কিছু থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে সতর্ক করেন (An-Nursī 2004, 259-260)। তিনি অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও বিরোধকে সামাজিক জাগরণে অন্তরায় তথা শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেন। কেননা এ তিন শত্রুই সামাজিক সকল অনাচার তথা সমস্যার মূল কারণ। আর এগুলোকেই মুসলিম বিশ্বে পশ্চাদপদতা ও অনৈক্যের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাই তিনি তৎকালীন সমাজের পশ্চাদপদতা ও ইসলামী বিষয়ে অজ্ঞতা লাঘবে জ্ঞানের প্রতি গুরুত্ব প্রদান

করেন। জাগতিক ও ধর্মীয় জ্ঞানের বিস্তারে মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এক্ষেত্রে মাদরাসার সংখ্যার চাইতে তার গুণগত মান; বিশেষত যুগের চাহিদা পূরণে সামর্থ্যবান জাতি গঠনে সক্ষমতার বিষয়টিকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। তবে এ সবকিছু থেকে ইখলাস (একনিষ্ঠা)কে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মানুষকে ইসলাম ও নৈতিকতার প্রতি আহ্বান করেন।

সাঈদ নূরসীর সংলাপ নীতি

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ইসলামী সমাজ তথা মুসলিম বিশ্বের সমস্যা সমাধান; বিশেষত পারস্পরিক সজ্ঘাত তথা বিরোধ ও দ্বন্দ্ব নিরসনে সংলাপ (Dialogue) ও যৌথ-অস্তিত্ব (Coexixtence)-এর উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন। প্রয়োজনে ভিন্ন ধর্মালম্বীদের সাথেও কার্যকর সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। কেননা সংলাপের মাধ্যমে সমাজের অনেক সমস্যাই সহজে সমাধান করা সম্ভব হয়ে থাকে। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় সংলাপের ক্ষেত্রেও তিনি আল-কুরআনের নীতি অবলম্বন করেন। সংলাপের ক্ষেত্রে আল-কুরআনের মূলনীতি হচ্ছে–কৌশল ও উত্তম উপদেশের আশ্রয় গ্রহণ করা। আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনে এরশাদ করেন:

﴿أُدْعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ﴾

আপনি কৌশলে এবং উত্তম উপদেশের মাধ্যমে আপনার পালনকর্তার প্রতি আহ্বান করেন এবং তাদের সাথে উত্তম পন্থায় বিতর্ক করুন (Al-Qurān, 16 :125)।

কেননা এ নীতির মাধ্যমে সহনশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে বিরোধী পক্ষ অনেক ক্ষেত্রে তাদের মতামতটি সহজে গ্রহণ করতে পারে। আল-কুরআনের এ শিক্ষা মোতাবেক সংলাপের ক্ষেত্রে নূরসীর নীতি ছিল:

১. সংলাপের শুরুতে ঈমান তথা বিশ্বাসকে প্রাধান্য প্রদান;
২. অপরের মতামত বিষয়ে সহনশীলতা প্রদর্শন;
৩. চিন্তা ও যুক্তির সাথে প্রমাণের সংযোগ স্থাপন;
৪. অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ পরিহার করা;
৫. চিন্তা ও অনুশীলনে বিন্যাস তথা সমন্বয় সাধন;
৬. জ্ঞান ও ধর্মের মাঝে সমন্বয় সাধন;
৭. জ্ঞান ও নৈতিকতার মাঝে সমন্বয় সাধন;
৮. সীমালঙ্ঘন পরিহার করে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা;
৯. সামগ্রিকভাবে ঐক্যের আহ্বান;
১০. ইসলামী সমাজকে সুদৃঢ়করণ;
১১. বিশুদ্ধ আকিদা (বিশ্বাস)-এর প্রতি গুরুত্বারোপ;
১২. সদাচারণ ও তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করা; ও
১৩. সূফীবাদের প্রতি গুরুত্বারোপ।

মোটকথা, বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী আধুনিক যুগের সূচনাকালে সেকুলার সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একজন সংস্কারক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এমন কোন দিক ছিল না, যে সম্পর্কে সংস্কারের লক্ষ্যে তিনি কাজ করেননি। তিনি যেমন মানুষের ঈমানের পরিশুদ্ধি ও সুদৃঢ়করণে কাজ করেন; অনুরূপভাবে সামাজিক অনাচার বিদূরীত করতে নিরলস পরিশ্রম করেন। তিনি ব্যক্তি থেকে সংস্কারের সূচনা করে সামষ্টিক সংস্কারের আহ্বান করেন। এ ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ পরিশুদ্ধির বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সর্বদা মুসলিম ঐক্যের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছেন।এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আল-কুরআন ও হাদীসের নীতির আলোকে মুসলিমদের বিভিন্ন দল-উপদল এবং প্রয়োজনে অমুসলিমদের সাথে সহনশীলতার সাথে সংলাপ চালিয়ে যাওয়ার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। আজকের এ চরম বিরোধপূর্ণ সমাজে বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর আদর্শ, দর্শন ও নীতি তথা আল-কুরআন ও হাদীসের নীতি অবলম্বন করে যদি সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা নতুনভাবে সাজানো যায় এবং তাঁর প্রদর্শিত পদ্ধতিতে মুসলিম উম্মাহর চিন্তানৈতিক মতবিরোধ নিরসনে কাজ করা যায়, তাহলে আশা করা যায় যে, মুসলিম সমাজের চলমান বিভক্তি ও ভেদাভেদ নিঃশেষিত হয়ে ঐক্যের পথ সুগম হবে; সর্বোপরি আধুনিক বিশ্বপরিমণ্ডলে বিরাজমান অস্থিরতার মাঝেও মুসলিম উম্মাহর কাছে শান্তি নামক সোনার হরিণ হাতের নাগালেই থাকবে।

Bibliography

Al-Qurān Al-Karīm

Al-ḍaghamīn, Ustād Dr. Jiyad Khalīl, 2008. *Min Qaḍayal Qurānī wal Insānī fī fikrī an-nursī: Naẓratun Tajdidiatun wa ru'yatun iṣlaḥiatun.*Al-Mamlaka Al Urdunia Al Hāshimiyya, Jāmia`tu Alil Baiti.

Al-Bukhārī ,Abū ʿAbd Allāh Muḥammad ibn Ismāʿīl , 1987 . *Al Jāmi al Musnad al – Ṣaḥīḥ* , Cairo : Dār Ibn Kathīr .

Alī, Aurkhan Muhammad. *Sayīd An Nursī: Rajul Qadrī fī ḥayātī Ummatin.*

Al-Kilanī, Dr. Jamal Uddin Falah, Aṣ ṣamdai`, Dr. Jaiyād Hamd. Nd. *Badiu`zzaman sayīd Nursī: Qira`tun Jadidatun Fī Fikrihil mustanir.* Qāhira: Dāruz Zanbaqah.

Al-Nīsābūrī, Abū al-Ḥusaīn Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qushairī, 1991 .*Ṣaḥīḥ Muslim* ,Cairo: Maṭbaʿa ʿĪsā al-Bābī al-Ḥalabī .

An Nursī, *Mudhakkaratu li naili darajatil mājistīr,* Jāmīa`tul A`qidil Hajj li khadar, al Jamhūriatul Jazairiyatul Dimukratiyatus Sha`rīayah.

An-Nursī, Sayīd, 1993(B), *Ash- Shaa`t*. Istambul: daru Sujalar.

An-Nursī, Sayīd, 2004 (A), *Al-Mulhiq*. Translate by Ehsan Qasīm Salehī. Istambul: daru Sujalar.

An-Nursī, Sayīd, 2004(A), *Al-Maktubāt*.Translate by Ehsan Qasīm Salehī. Istambul: daru Sujalar.

An-Nursī, Sayīd, 2004(D), *Saikalul Islam(Al Kutbatush shamīa`tu)*.Translate by Ehsan Qasīm Salehī. Istambul: daru Sujalar.

An-Nursī, Sayīd, 2004(E), *Siratun dhātīyatun* .Translate by Ehsan Qasīm Salehī. Istambul: daru Sujalar.

An-Nursī, Sayīd, 2010, *Siratun dhātīyatun*.Translate by Ehsan Qasīm Salehī. Istambul: daru Sujalar.

Ash shaibānī, *Kitabus Sunnah*, Nd.

*Badiu`zzaman sayīd An Nursī,* Mudhakkaratu li naili darajatil mājistīr Jāmīa`tul A`qidil Hajj li khadar, al Jamhūriatul Jazairiyatul Dimukratiyatus Sha`rīayah.

http://ar.wikipedia.org/wiki/بديع_الزمان_سعيد_النورسي

Nursi, Bediuzzaman Said. 2009 *.The Flashes Collection ('Lem'alar')* .Translated by : Şükran Vahide . Istambul: Sozler Neşriyat A.Ş.

Ṭanṭāwi, Abdullah. Nd. *Manhajul iṣlāhī wat taghyī i̒nda Badiu`zzaman sayīd An Nursī.* Dimashq: Dārul ʻI`lm

Wahidah, Sakrān, 2008, *Al-Islāmiyatu fī turakiyatul Hadhith: Badiu`zzaman sayīd An Nursī.* Translate by Muhammad faḍil.

Warghi, Ash- Shaikhatu. 2007-2008. *Al bu`dur Ruhī fī Manhajid Da`wati I`nda*